ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 557-563
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.244

সকল বিজ্ঞানের রাণী ও জননী হিসেবে দর্শন: একটি সমীক্ষণ

খোকন সেখ, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 15.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

From ancient times, philosophy has been regarded as the queen and mother of all sciences. At a stage when human knowledge had not yet been divided into distinct disciplines, philosophy functioned as the comprehensive field of intellectual inquiry. Although mathematics, physics, biology, sociology, and other sciences later emerged as independent disciplines, their fundamental concepts, methods, and guiding questions were rooted in philosophy. The aim of this survey is to analyze how philosophy has shaped the foundational questions, conceptual frameworks, and epistemological bases of the sciences, and to explain, with reasoned arguments, why philosophy is still regarded as the mother of all sciences. The paper argues that philosophy is not merely speculative or doctrinal but serves as a critical and integrative framework that guides scientific reasoning, innovation, and self-reflection. Thus, philosophy remains indispensable as both the origin and ongoing foundation of all scientific disciplines.

Keywords: Science, Philosophy, Philosophy of Science, Foundations of Knowledge, Scientific Method, Epistemology, Philosophy and Science, Queen of all Sciences, Mother of all Subject

মানুষ যখন থেকে পৃথিবীতে এসেছে, তখন থেকেই তার মধ্যে জানার স্পৃহা বিদ্যমান। মানুষ অজানাকে জানতে ও বুঝতে চায়; প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা তার চিরন্তন। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ এই রহস্যময় জগতের সামনে বারবার 'এটা কী?'— এই প্রশ্ন উত্থাপন করে জানার ও বোঝার চেষ্টা করে আসছে। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ অজানাকে জানার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে চায় এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জগৎ ও জীবনের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা চালায়। জ্ঞান সংগ্রহের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করে। অজানাকে জানার এই অনুরাগই হলো দর্শন (Philosophy)। অতএব, দর্শন হলো জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। প্রাচীনকাল থেকেই দর্শন সবকিছুর ওপর অধ্যয়ন হিসেবে স্বীকৃত। দর্শন এমন এক ধরনের অধ্যয়নকে বোঝায়, যা বিভিন্ন বিষয়কে সমালোচনামূলক ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে। 'দর্শন' শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত— 'ফিলো' (Philo), যার অর্থ প্রেম, এবং 'সোফিয়া' (Sophia), যার অর্থ জ্ঞান। সুতরাং দর্শনের অর্থ হলো জ্ঞানের প্রতি প্রেম। এই অর্থে, একজন দার্শনিক হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি জ্ঞানকে ভালোবাসেন এবং তা অর্জনের জন্য নিরন্তর অনুসন্ধান করেন।

গ্রিক দর্শনের পর্যালোচনা: প্রাচীন গ্রিক দর্শনের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সে সময়ে ফিলোসফি বা দর্শন ছিল একটি 'বিষয়পুঞ্জ'[১]। এই বিষয়পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছিল সকল প্রকার জ্ঞানের অনুসন্ধান ও আলোচনা;

অর্থাৎ জগতের প্রায় সব বিষয় নিয়েই দর্শনের আওতায় আলোচনা হতো। পিথাগোরাসই প্রথম এই অনুসন্ধানমূলক জ্ঞানচর্চার নামকরণ করেন 'ফিলোসফি'। বর্তমানে যেসব বিষয়কে আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) বলে গণ্য করি, সেগুলোর আলোচনাও প্রাচীন গ্রিক দর্শনের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থেলিস যে প্রশ্নটি করেছিলেন— "What is the stuff of this world?"[২] —তা মূলত পদার্থবিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রশ্ন, কোনো অধিবিদ্যামূলক (metaphysical) প্রশ্ন নয়। তিনি বাস্তবতা (reality) বা অবাস্তবতা (unreality) নিয়ে প্রশ্ন না তুলে জগতের মূল উপাদান কী—সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন।এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেন জগতের মূল উপাদান জল[৩], কেউ বলেন আগুন[৪], আবার কেউ বলেন বায়ু[৫]। থেলিসের এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের অনুসন্ধান, জগতের স্বরূপ অন্বেষণ এবং সর্বোপরি একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সূচনা করা।

দর্শন তার সূচনা করে বিস্ময় থেকে এবং 'কেন'— এই মৌলিক প্রশ্নের মাধ্যমে। এই প্রশ্নই জ্ঞানচর্চার অন্যান্য শাখার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশ দর্শনের সঙ্গে তার এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে, যার ফলে তার অধ্যয়নের ক্ষেত্র আরও গভীর ও শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতির ওপর বিশ্বাস করা উচিত— তা নিয়ে দর্শনে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। এই প্রবন্ধ বিশেষভাবে যুক্তিবাদী ও অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তবে আধুনিক অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত পদ্ধতির কিছু মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে। এই পদ্ধতি প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেহারা বা প্রকাশের ওপর নির্ভর করে, যা আমাদের অনেক সময় অচল অবস্থায় নিয়ে যায়। কারণ আমরা জানি, বাস্তবতা বা সত্য কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে যা উপস্থাপিত হয়, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

আধুনিক অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানীদের দর্শনের ভূমিকাকে কেবল একটি সূচনা বিন্দু হিসেবে নয়, বরং সমস্ত জ্ঞানের উপসংহার হিসেবেও বিবেচনা করা ও উপলব্ধি করা উচিত। দর্শনকে গ্রহণ করলে বিজ্ঞানীরা একটি শক্তিশালী বৌদ্ধিক ভিত্তি লাভ করবেন, যা তাদের নতুন প্রযুক্তি ও সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনে আরও সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী করে তুলবে।প্রাচীনকাল থেকেই দর্শন সবকিছুর ওপর অধ্যয়ন হিসেবে স্বীকৃত। দর্শন এমন এক ধরনের অধ্যয়নকে বোঝায়, যা বিভিন্ন বিষয়কে সমালোচনামূলক ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে। 'দর্শন' শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত—'ফিলো' (Philo), যার অর্থ প্রেম, এবং 'সোফিয়া' (Sophia), যার অর্থ জ্ঞান। সুতরাং দর্শনের অর্থ হলো জ্ঞানের প্রতি প্রেম। এই অর্থে, একজন দার্শনিক হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি জ্ঞানকে ভালোবাসেন এবং সত্যের অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকেন।

বিজ্ঞানের রাণী ও জননী হিসেবে দর্শন: প্রাচীনকাল থেকেই দর্শনকে সকল বিজ্ঞানের রাণী ও জননী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। এর প্রধান কারণ হলো— প্রাথমিক পর্যায়ে দর্শনই ছিল জ্ঞানের সকল শাখার উৎস। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের যেসব শাখা আজ স্বতন্ত্র রূপে বিকশিত হয়েছে, সেগুলোর বীজ নিহিত ছিল দর্শনের মধ্যেই। ফলে দর্শন এসব বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত মূল্য, অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত। যদিও আধুনিক যুগে এসব শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পরিভাষা গ্রহণ করেছে, তবু ব্যুৎপত্তিগত ও ধারণাগতভাবে সেগুলো গ্রিক দর্শনের বোধগম্যতার সঙ্গেই যুক্ত।

প্রাচীন দার্শনিকদের অন্তর্দৃষ্টি থেকেই বহু আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ডেমোক্রিটাসের পরমাণু তত্ত্ব। প্রায় ২৩০০ বছরেরও বেশি সময় আগে তিনি পরমাণুর ধারণা উপস্থাপন করেন। ডেমোক্রিটাস বিশ্বাস করতেন যে জগতের সকল বস্তু ক্ষুদ্র, অবিভাজ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত এবং তিনি সবকিছুর অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় এই ধারণায় উপনীত হন। যদিও

সে সময় এই ধারণাটি অনেকের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল, আধুনিক বিজ্ঞান পরবর্তীকালে পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে এবং এই আবিষ্কার আমাদের জগৎ সম্পর্কে বোঝাপড়াকে আমূল পরিবর্তন করেছে। ডেমোক্রিটাস, যিনি প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে তাঁর দর্শন বিকশিত করেন, পদ্ধতিগতভাবে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সমগ্র মহাবিশ্ব বিভিন্ন আকার, আকৃতি ও বিন্যাসের ক্ষুদ্র বস্তুগত কণা—পরমাণু—দ্বারা গঠিত, যা শূন্যের মধ্যে গতিশীল এবং নির্দিষ্ট কার্যকারণ নীতির অনুসরণে একে অপরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। এই অর্থে, ডেমোক্রিটাসকে পারমাণবিক তত্ত্বের জনক বলা হয়, যা প্রায় ২৩০০ বছর পরে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে[৬] এই উদাহরণটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে দার্শনিকরা আধুনিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানের বিকাশে কতটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এটি আরও নির্দেশ করে যে ধারণা ও তাত্ত্বিক চিন্তা এক অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান, যা আধুনিক বিজ্ঞানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি দীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল যৌথ ইতিহাস রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মার্টিন হাইডেগার উল্লেখ করেন যে, "দর্শন বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা ও প্রস্তাবনার ওপর ধ্যান করে এবং এর মাধ্যমে বিজ্ঞানকে তাদের কঠোর শ্রম থেকে মুক্তি দেয়।" এই বক্তব্য আরও প্রমাণ করে যে দর্শনকে সমস্ত জ্ঞানের সার্বজনীন কাঠামো পরিচালনার জন্য একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।[৭]

একইভাবে ল্যামন্ট বলেন, "দার্শনিকরা সর্বদা মানুষকে জিনিসের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেন; যা কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত করা হয়েছে, তা পুনরায় একত্রিত করেন। সংক্ষেপে বলা যায়, ক্রমবর্ধমান বিশেষায়নের এই যুগে সাধারণীকরণে বিশেষজ্ঞ হওয়াই দার্শনিকের প্রধান কাজ, যা আজ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"[৮]

"বিজ্ঞানের জননী কোনো মতবাদ নয়"— এই আপাত-বিরোধাভাসী দাবিটি থেকেই এই অনুসন্ধানের সূচনা। আধুনিক যুগে দর্শনকে প্রায়ই নিছক চিন্তার খেলা বা একটি মতবাদ হিসেবে খারিজ করা হয়। কিন্তু যদি দর্শনের প্রকৃত কাজ বিশ্বাস প্রদান না হয়ে প্রশ্ন নির্মাণ হয়, তবে কি দর্শনের ভূমিকা নতুন করে ভাবার প্রয়োজন নেই? আমি সবসময় বিজ্ঞানকে ভালোবাসতাম। কিন্তু একসময় লক্ষ করলাম, আমি ক্রমাগত একটি প্রশ্নই করছি—"কেন? কেন আমরা যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি করি? কেন মানুষ মরণশীল? কেন আমরা বিরোধিতার মুখোমুখি হতে ভয় পাই? এই প্রশ্ন করতে করতেই আমি শেষ পর্যন্ত দর্শনের জগতে এসে পড়ি। অথচ আধুনিক জগতে দর্শনকে ক্রমেই অস্পষ্ট ও অপ্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছে— প্রায়ই একে মতবাদ হিসেবে দেখা হয়। এই সংকোচনের ফলে আমরা হয়তো ভুলে গেছি একটি মৌলিক সত্য: দর্শন যদি প্রথমে "কেন?" প্রশ্ন না করত, তবে বিজ্ঞানের অস্তিত্বই হয়তো সম্ভব হতো না। ক) বিজ্ঞান হলো সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা পর্যবেক্ষণ, অনুমান ও যাচাইয়ের সাহায্যে পৃথিবী কীভাবে কাজ করে তা বোঝার চেষ্টা করি। এটি যুক্তি, পুনরাবৃত্তি এবং পরিমাপযোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রতিটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সূচনায় থাকে একটি সরল অথচ গভীর প্রশ্ন— "এটা কেন ঘটে?" এই অর্থে, প্রশ্ন করাই বিজ্ঞানের মৌলিক উপাদান। খ) এই "কেন?" আসে কোথা থেকে? এটি জন্ম নেয় পর্যবেক্ষণ থেকে— অস্বস্তি, বিরোধিতা কিংবা প্রত্যাশিত প্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে। প্রশ্ন করার এই প্রবণতাটাই মূলত দর্শন। প্রাচীন দার্শনিকরা কেবল চিন্তাবিদ ছিলেন না; তাঁরাই ছিলেন প্রথম প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। থেলিস, ডেমোক্রিটাস, আর্কিমিডিস— তাঁদের প্রশ্ন থেকেই পদার্থবিদ্যা, গণিত ও বিজ্ঞানের জন্ম। গ) আজ দর্শনকে প্রায়ই মতবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এটি একটি মৌলিক ভুল বোঝাবুঝি। মতবাদ যেখানে বিশ্বাস ও আবেগের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, দর্শন সেখানে দাঁড়ায় যুক্তি ও লজিক্যাল সামঞ্জস্যের ওপর।

সম্ভবত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের একটি অংশ ভাষাগত জটিলতা ও অস্পষ্ট বিমূর্ততাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করায় তার প্রকৃত ভূমিকা আড়াল হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো চিন্তা যদি লজিক্যালভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তাকে কি নিছক মতবাদ হিসেবে খারিজ করা যায়? ঘ) যদি দর্শন সত্যিই বিজ্ঞানের হয়, তবে বিজ্ঞান কেন তার থেকে দূরে সরে গেল? এর উত্তর নিহিত আছে দর্শনের একটি বিকৃতিতে। যখন আবেগনির্ভর দাবি ও যাচাই-অযোগ্য ভাষা যুক্তিনির্ভর অনুসন্ধানকে ঢেকে ফেলল, তখন বিজ্ঞান নিজেকে সেই পরিসরে কাজ করতে অক্ষম মনে করল। বিজ্ঞান চায় স্পষ্টতা—অস্পষ্টতা নয়। ফলে একসময় দর্শন তার "প্রশ্নকর্তা" ভূমিকা ছেড়ে বিশ্বাস ও চূড়ান্ত ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকে পড়লে, বিজ্ঞান বাধ্য হয় দূরে সরে যেতে। ঙ) বিজ্ঞান ও চিন্তার মধ্যে প্রকৃত বিভাজন বিষয় বা লেবেল নয়—বিভাজন হলো সামঞ্জস্য। এমনকি সবচেয়ে অদ্ভুত ধারণাও, যদি তা পর্যবেক্ষণ থেকে আসে এবং লজিক্যাল সামঞ্জস্য বজায় রাখে, তবে তা বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস হতে পারে। অন্যদিকে, সামঞ্জস্যহীন ধারণা পড়ে থাকে বিশ্বাস, মতবাদ বা কল্পনার জগতে। যতক্ষণ দর্শন লজিক্যালি কোহেরেন্ট থাকে, ততক্ষণ তা বিজ্ঞানের অংশ। চ) মানুষ বিরোধিতাকে ভয় পায়। কিন্তু বিরোধিতা উপেক্ষা করলে তা অদৃশ্য হয় না—বরং জমে ওঠে এবং একসময় ধ্বংস ডেকে আনে। দর্শন তার শ্রেষ্ঠ অবস্থায় হলো এই বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবার প্রশ্ন করার সাহস। এই সাহসই নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দেয়। ছ) বিজ্ঞান দর্শন থেকে জন্মেছে—এটি সত্য। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান অনেক সময় নিজের "কেন?" নিজে তৈরি না করে বাইরের উৎস থেকে ধার করে। ফলে বিজ্ঞান ধীরে ধীরে অনুসন্ধানীর বদলে কেবল মাপজোখকারী হয়ে ওঠে। হয়তো সময় এসেছে বিজ্ঞানের আবার দর্শনের দিকে ফিরে তাকানোর। দর্শন কি এখনও বিজ্ঞানের মা কিন্তু মতবাদ হিসেবে নয়, বিশ্বাসব্যবস্থা হিসেবে নয়। শুধু কোহেরেন্ট প্রশ্ন নির্মাণের কাঠামো হিসেবে দর্শন এখনও বিজ্ঞানের মা হতে পারে। দর্শন প্রশ্ন তৈরি করে, বিজ্ঞান উত্তর দেয়। একটিকে বাদ দিলে চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকে। বিজ্ঞানের মা মতবাদ নয়— সে হলো সামঞ্জস্য নিজেই, সেই প্রশ্নের কাঠামো যা চুপ থাকতে অস্বীকার করে।

Alex Rosenberg তাঁর *Philosophy of Science: A Contemporary Introduction* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, প্রাথমিকভাবে দর্শন ছিল জ্ঞানের একটি সমগ্র বিষয়পুঞ্জ। পরবর্তীকালে যখন এই বিষয়পুঞ্জ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্র ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র বিষয় (subject-matter) হিসেবে পৃথক হয়ে যেতে শুরু করে, তখন তারা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায় নির্দিষ্ট গবেষণাক্ষেত্র ও পদ্ধতি[৯]। কিন্তু একই সঙ্গে কিছু মৌলিক ও ভিত্তিমূলক প্রশ্ন দর্শনের ক্ষেত্রেই থেকে যায়[১০]। এই প্রশ্নগুলো এমন, যেগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা অতীতে আলোচনা করেননি এবং ভবিষ্যতেও করবেন না।এই প্রেক্ষাপটেই প্রায়ই বলা হয়—*philosophy is the mother of all subjects*। তবে এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়: বিজ্ঞানীরা কেন এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন না, কিংবা ভবিষ্যতেও কেন দেবেন না?

এর উত্তরে Rosenberg বলেন—

> "...initial questions are itself a matter that can only be selected by philosophical arguments."[১১]

অর্থাৎ, কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করার আগেই যে প্রশ্নগুলো নির্বাচন করা হয়, সেগুলোর নির্বাচন নিজেই একটি দার্শনিক প্রক্রিয়া; এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আওতাভুক্ত নয়। ফলে এই ভিত্তিমূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়েও বিজ্ঞান তার নিজস্ব সীমার মধ্যে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। তবু এখানেই একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক সমস্যা রয়ে যায়— যে বিজ্ঞান তার সূচনা প্রশ্নগুলোর যৌক্তিকতা ও অর্থ নির্ধারণ করতে পারে

না, সে বিজ্ঞান কীভাবে নিজের জ্ঞানগত ভিত্তিকে সম্পূর্ণ বলে দাবি করতে পারে? এই ধরনের প্রশ্নই বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে এক গভীর ও সূক্ষ্ম দার্শনিক বিতর্কের জন্ম দেয়।

দর্শন ও গণিতের সম্পর্ক:

দর্শন ও গণিতের মধ্যকার সম্পর্কের আলোচনায় সর্বপ্রথম প্লেটোর দর্শন ও সংখ্যাবিষয়ক ধারণার কথা উল্লেখযোগ্য। প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে গাণিতিক সত্যসমূহ হলো বিমূর্ত সত্তা (abstract entities), যেগুলো বাস্তব জগতের বস্তুসমূহের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়। তাঁর মতে, সংখ্যা কোনো ভৌত বস্তু নয়; বরং এগুলো এমন এক ধরনের সত্য, যা আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে সংখ্যার ধারণা এবং সংখ্যাকে প্রকাশকারী প্রতীক এক নয়। উদাহরণস্বরূপ, "2", "II" অথবা "দুই"— সবগুলোই একই সংখ্যাকে নির্দেশ করে, কিন্তু প্রতীকগুলো ভিন্ন। এতে স্পষ্ট হয় যে সংখ্যা নিজেই একটি বিমূর্ত ধারণা, আর প্রতীক কেবল তার প্রকাশমাত্র। এই উপলব্ধি আমাদের জ্ঞান, বাস্তবতা এবং বিমূর্ততার প্রকৃতি নিয়ে গভীর দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করে।

দর্শন ও পদার্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক: সময়ের সমস্যা

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পদার্থবিজ্ঞানে। উদাহরণস্বরূপ, নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী বল (F) ভর (m) এবং ত্বরণ (a)- এর গুণফলের সমান,
অর্থাৎ

F = ma।
এখানে ত্বরণ হলো বেগের সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তন,
অর্থাৎ

a = dv/dt।

এই সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যা সামনে আসে— সময় কী? স্থান (space) পরিমাপের জন্য যেমন মিটার বা গজের মতো নির্দিষ্ট একক রয়েছে, সময়ের ক্ষেত্রেও সেকেন্ড, মিনিট বা ঘণ্টার মতো একক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো— এই এককগুলোর দার্শনিক ভিত্তি কী? সময় কি একটি স্বাধীন বাস্তব সত্তা, নাকি এটি কেবল পরিবর্তনের পরিমাপক? এই প্রশ্নটি প্রায় ৩০০ বছর ধরে দর্শন ও বিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা। বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আলবার্ট আইনস্টাইন দেখান যে সময় কোনো পরম সত্তা নয়; বরং এটি পর্যবেক্ষকের রেফারেন্স ফ্রেমের উপর নির্ভরশীল। ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষকের কাছে একই ঘটনার সময়কাল ভিন্ন হতে পারে।

এখানেই নিউটনের ধারণার বিরুদ্ধে দার্শনিক লাইবনিজের সমালোচনার গুরুত্ব বোঝা যায়। নিউটন যেখানে স্থান ও সময়কে স্বাধীন পাত্র (absolute containers) হিসেবে দেখেছিলেন, লাইবনিজ সেখানে সময়কে ঘটনাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এটি দেখায় যে সময়ের প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান।

দর্শন ও জীববিজ্ঞানের সম্পর্ক: বিবর্তন ও উদ্দেশ্যের প্রশ্ন

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট, বিশেষত ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবের বৈচিত্র্য এবং মানবজাতির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে। কিন্তু ডারউইনের তত্ত্বে কোনো পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই। অনেক জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক মনে করেন, বিবর্তন একটি অন্ধ প্রাকৃতিক

প্রক্রিয়া—এতে কোনো "অর্থ" বা "উদ্দেশ্য" আরোপ করা হয় না। এই বিষয়টি দর্শন ও ধর্মের জন্য গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করে:

যদি প্রকৃতিতে কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তবে মানব জীবনের অর্থ কী?

উপসংহার:

উপরের আলোচনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান— সব ক্ষেত্রেই কিছু মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলোর উত্তর কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেওয়া সম্ভব নয়। সংখ্যা কী, সময় কী, বা বিবর্তনে কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না— এই প্রশ্নগুলো মূলত দার্শনিক।এই কারণেই দর্শনকে প্রায়ই সকল বিজ্ঞানের জননী বলা হয়। বিজ্ঞান নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান দেয়, আর দর্শন সেই সমস্যাগুলোর অর্থ, ভিত্তি ও সীমা নির্ধারণ করে। দুটিকে আলাদা করা সম্ভব নয়— দর্শন ছাড়া বিজ্ঞান অন্ধ, আর বিজ্ঞান ছাড়া দর্শন শূন্য।দর্শন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের অনুঘটক এবং সকল বিজ্ঞানের মা/জননী ও রাণী দর্শনকে বৈজ্ঞানিক ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির একটি অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। একই সঙ্গে দর্শনকে সকল বিজ্ঞানের মা ও রাণী বলা হয়, কারণ বিজ্ঞানের মৌলিক প্রশ্ন, সীমা ও অর্থ নির্ধারণের কাজ দর্শনই করে থাকে।

প্রথমত, বিজ্ঞানের এমন বহু প্রশ্ন রয়েছে— ভৌত, জৈবিক, সামাজিক ও আচরণগত—যেগুলোর উত্তর বর্তমান বিজ্ঞান দিতে অক্ষম এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও দিতে পারবে না। এই প্রশ্নগুলোর আলোচনাই দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ। অর্থাৎ, দর্শন সেই সকল প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করে যেগুলো এখনো বৈজ্ঞানিকভাবে সমাধানযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, দর্শন শুধু এসব প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করে না; বরং আরও একটি গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করে— কেন বিজ্ঞান এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে না? এই পর্যায়ে দর্শন বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, পদ্ধতিগত গঠন এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসর বিশ্লেষণ করে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দর্শন মূলত এমন সব প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে, যেগুলোর উত্তর বিজ্ঞান এখনও দিতে পারে না, অথবা হয়তো কখনও দিতে পারবে না। এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াতেই দর্শন নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। এই ধরনের প্রাথমিক বা মৌলিক প্রশ্নসমূহ নিজেরাই এমন এক বিষয়, যেগুলোর মীমাংসা কেবল দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমেই সম্ভব। যদি এমন প্রশ্ন না থাকত, তবে বিজ্ঞানকেও তার অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর উত্তর খুঁজতে দর্শনের দ্বারস্থ হতে হতো। ফলে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যকার সম্পর্ক একটি অনিবার্য দার্শনিক বিতর্কের জন্ম দেয়। এই কারণেই বিজ্ঞানীদের জন্য দর্শনের ইতিহাসের একটি মৌলিক অধ্যয়ন অপরিহার্য। গ্রিক দর্শন থেকে শুরু করে নিউটন, ডারউইন এবং আধুনিক বিজ্ঞান পর্যন্ত— বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এমন প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেগুলো প্রথমে ছিল দার্শনিক। এই ইতিহাস আমাদের এমন অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি করে, যেগুলোর এখনো বৈজ্ঞানিক উত্তর পাওয়া যায়নি।অতএব বলা যায়, বিজ্ঞান কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, কারণ সেগুলো বিজ্ঞানের বিষয় নয়— সেগুলো দর্শনের বিষয়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে বিজ্ঞানীদের উচিত দর্শনের সাহায্য নেওয়া এবং বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দার্শনিক ভিত্তি গভীরভাবে অধ্যয়ন করা। তবেই বিজ্ঞান তার সীমা অতিক্রম করে আরও সৃজনশীল, উদ্ভাবনী ও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1. Rosenberg, Alex. Philosophy of Science: A contemporary introduction. Routledge, 2005, New York and London, pp. 1.
2. Masih, Y. A critical history of western philosophy. Motilal Banarashidass PVT. LTD., 2017 Delhi, pp. 4.
3. Ibid., pp. 4.
4. Ibid., pp.17.
5. Ibid., pp.6.
6. Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism, 8th Edition. pp. 42.
7. Shanker, G. Stuart Cf., eds. Philosophy of Science. Logic and Mathematics in Twentieth Century, Vol. Ix, 235.
8. Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism, 8th Edition. pp. 7.
9. Rosenberg, Alex. Philosophy of Science: A contemporary introduction. Routledge, 2005, New York and London, pp. 1.
10. Ibid., pp. 1.
11. Ibid., pp. 12.

সহায়ক গ্রন্থ:

1. Heidegger, Martin. Modern Science, Metaphysics and Mathematics. Yale University, London, 2000.
2. Meiklejohn, J.M.D trans. Immanuel Kant, The Critique of Pure Reason.
3. Shanker, G. Stuart, eds. Philosophy of Science. Logic and Mathematics in Twentieth Century, Vol. Ix, Routledge: London, 1996.
4. Rosenberg, Alex. Philosophy of Science: A contemporary introduction. Routledge, New York and London, 2005.
5. Masih, Y. A critical history of western philosophy. Motilal Banarashidass PVT. LTD. Delhi, 2017.
6. Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism, 8th Edition. Humanist Press, New York, 1997.